ভারতে বিচারবহির্ভূত হত্যা : সাজানো এনকাউন্টারের স্বীকারোক্তি

কিশোলয় ভট্টাচার্য

ভারতীয় সাংবাদিক কিশোলয় ভট্টাচার্যের *'ব্লাড অন মাই হ্যান্ডস : কনফেশনস অব স্টেজড এনকাউন্টারস'* (হারপারকলিন্স পাবলিশার্স, ইন্ডিয়া, ২০১৫) এর দুটি অধ্যায় : 'কনফেশনস : দ্য হেডকাউন্ট' ও 'কনফেশনস : দ্য ট্রেড' থেকে এই অনুবাদ করা হয়েছে। মূল বইটি ভারতের আসাম ও মনিপুরে দীর্ঘ সময় 'সন্ত্রাসবিরোধী' অভিযানে নিয়োজিত এক সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তার সাজানো এনকাউন্টার বিষয়ক স্বীকারোক্তির ওপর ভিত্তি করে লেখা। কিশোলয় ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ অনুসারে এনকাউন্টার বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ঘটলেও উপনিবেশ-উত্তর ভারতের ইতিহাসে সেই অঞ্চলগুলোতেই এনকাউন্টার সবচেয়ে বেশি হয়েছে, যেখানে জরুরি অবস্থা জারি রয়েছে। সেই হিসাবে ভারত আর বাংলাদেশের বিচারবহির্ভূত হত্যার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। কিন্তু প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর আচরণ ও চরিত্র, মানুষের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, গণমাধ্যমের ভূমিকা, নাগরিক সমাজের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিবেচনায় নানান মিলও রয়েছে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটের এই স্বীকারোক্তিটি সাধারণভাবে কোন্ ধরনের পরিস্থিতিতে 'এনকাউন্টার' করা হয়, এনকাউন্টারের পেছনে কী কী বিষয় প্রভাবক হিসেবে কাজ করে, এনকাউন্টারের প্রক্রিয়া, এনকাউন্টারকারীর মানসিকতা ও মানসগঠন, রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি সম্পর্কে বোঝাপড়ায় ভূমিকা রাখতে পারে। সর্বজনকথার জন্য এই অনুবাদ করেছেন **কল্লোল মোস্তফা**।

কনফেশনস: দ্য হেডকাউন্ট

কোন যুদ্ধ বা লড়াইয়ের পরিস্থিতিতে 'এনকাউন্টার' বলতে মূলত দুটি বিবদমান সশস্ত্র দলের পরস্পরকে মোকাবিলা করার ঘটনাকে বোঝানো হয়। মোকাবিলা হতে পারে গোয়েন্দা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। এক পক্ষ তার সুবিধামত সময়ে অপর পক্ষকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে আসার মাধ্যমেও এই মোকাবিলা ঘটতে পারে। এ হল সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এনকাউন্টারের অর্থ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই শব্দটির অর্থ এখন পাল্টে গেছে। ভারতে এটা এখন অসামরিক শব্দে পরিণত হয়েছে। এই শব্দটির মাধ্যমে এখন কাউকে ধরে নিয়ে ঠান্ডা মাথায় খুন করা বোঝায়।

সামরিক জগতে এনকাউন্টারের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। এর মধ্যে একটা হল অভিযানে গিয়ে গুলির মুখোমুখি হয়ে পাল্টা গুলি করা। ফেইক বা ভুয়া এনকাউন্টার হল সাজানো এনকাউন্টারের মাধ্যমে কোন জঙ্গিকে হত্যা করা। আর ফলস বা মিথ্যা এনকাউন্টার হল একেবারে নির্দোষ ব্যক্তিকে এনকাউন্টারের নামে হত্যা করা।

এনকাউন্টারের শুরু হয় পাঞ্জাবে কে পি এস জিলের [পাঞ্জাবের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ–অনুবাদক] আমলে। এনকাউন্টারের বেসামরিক অর্থ এই জিলই চালু করেন। সেনাবাহিনীও তখন তা শিখে নেয়। কে পি এস জিল পাঞ্জাবে প্রায় সরাসরি ফেইক বা ভুয়া এনকাউন্টারের কথা স্বীকার করে ফেলেছিলেন।

না, আমার মনে হয় ভুল হচ্ছে... ...এনকাউন্টারের ঘটনা প্রথম ঘটে ষাটের দশকে অন্ধ্র প্রদেশে আর তারপর পশ্চিমবঙ্গে। প্রথম এনকাউন্টারের ঘটনা নথিভুক্ত হয় তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সময়। আর পশ্চিমবঙ্গে নকশালদের আত্মসমর্পণের সময় মুখ্যমন্ত্রী এস এস রায় তরুণদের খুন করে দায়মুক্তি পান। সবাই মনে হয় সেই সব সময়ের কথা ভুলে বসে আছে। তিনি এতই কুখ্যাত হয়েছিলেন যে তাঁকে পাঞ্জাবের সশস্ত্র অভ্যুত্থান দমনের জন্য গভর্নর করে নিয়ে যাওয়া হয়, যখন কে পি এস জিল ইতোমধ্যেই তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বাংলা ও পাঞ্জাবের ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়ার পরই আসামের অন্ধকার যুগের শুরু। এখানে নোংরা এই খেলাটি এতটাই ভয়ংকর রূপ ধারণ করে যে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের মাত্রাটি কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। দেখুন, বাংলা ও পাঞ্জাবে কংগ্রেস অভ্যুত্থান দমন করতে পারলেও ক্ষমতায় কিন্তু আর ফিরতে পারবে না–অন্তত অদূর ভবিষ্যতে না। ক্ষত প্রশমিত হতে কয়েক প্রজন্ম লাগবে। কিন্তু আসামে রাজনৈতিক দল স্মার্টভাবে অন্যদের দিয়ে নিজেদের নোংরা কাজগুলো করিয়েছে। এজিপিকে (আসাম গণ পরিষদ) এনকাউন্টারের জন্য দায়ী করা হয়, দেখুন এই দলটির এখনকার পরিণতি। দলটি ধ্বংস হয়ে গেছে। কংগ্রেস এনকাউন্টারের সূচনা করলেও এর থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে এবং অন্যদের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

আদালতের নির্দেশে অভিযানগুলোতে বেসামরিক প্রশাসনকে যুক্ত করা হয়। উদ্যোগটা এনকাউন্টার বন্ধ করার জন্য নেয়া হলেও তাতে সফলতা আসেনি। উল্টো এনকাউন্টার বৃদ্ধি পেয়েছে। আর পাঞ্জাবের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। সেনাবাহিনী ও রাজ্য পুলিশ তখন উদ্দেশ্য পূরণে কিভাবে আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করা যায় তা ভালই শিখে নিয়েছিল। জাতীয় স্বার্থের কথা বলেই এসব জায়েজ করা হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে দেখুন : তারা কত আফগানকে আটক করে রেখেছে। এমনকি পাঁচজন তালেবানকে ছেড়েও দিয়েছে। ভারতে হলে সবাইকেই হত্যা করা হত। কাউকে ছেড়ে দেয়া হত না, কারণ ছেড়ে দেয়ার মত কেউ অবশিষ্ট থাকত না।

চাপের ব্যাপারটা বোঝা কঠিন নয়। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, আপনার এলাকায় দশজন সক্রিয় জঙ্গি রয়েছে। সুতরাং আপনার কাজ হল এদের ধরে ফেলা অথবা হত্যা করা। কিন্তু এদের ধরা তো সহজ নয়। পুরনো একটা গেরিলা যুদ্ধ চলছে এখানে। এখানে ১৯৫০-এর দশক থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে এবং আমরা এটাকে 'গ্রহণযোগ্য মাত্রায়' সীমাবদ্ধ রাখতে পেরেছি। এটা পরিষ্কার যে আমরা তাদের পুরোপুরি প্রতিরোধ করতে পারিনি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সশস্ত্র সংগ্রামের ধরন বিবেচনায় তাদের সশস্ত্র লড়াইয়ে টেনে আনা কঠিন। তাহলে কী করা যেতে পারে? আমার কাজের চরিত্র অনুযায়ী আমার কাজ–হয় ধরা, না হয় মারা। শান্তির পরিবেশ তৈরি ও পুনর্মিলন ঘটানো কোন কাজের কথা না। আমাদের কাজ হল প্ররোচিত করা ও নির্মূল করা। এই কাজে ব্যর্থ হলে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়, কোন অজুহাতই কাজ করে না। যাও, খুন করো আর হেডকাউন্ট দেখাও, অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর জব্দ তালিকা দেখাও।

চাপ মোকাবিলা করার জন্য পুলিশের সাহায্যে জঙ্গি তৈরি করা হয়–পুলিশ ও প্রশাসন পরিস্থিতি বুঝে এই ধরনের জঙ্গি তৈরি করে। হতে

পারে হত্যাকান্ডের শিকারদের সবাই নিরীহ নয়। পুলিশও তার রেকর্ড ঠিকঠাক করে নেয় এবং অপরাধীদের নির্মূল করে। সুতরাং এর মধ্য দিয়ে দুটো উদ্দেশ্য সাধিত হয়। অপরাধীদের নির্মূল করা হয়। এ ক্ষেত্রে কিছু প্রতিশোধের ব্যাপারও যুক্ত থাকে। ব্যক্তিগত হিসাব সব চুকিয়ে নেয়া হয়। যখন আর্মি ও পুলিশের ওপর চাপ বেশি থাকে তখন সীমানা অতিক্রম করে আসা অচেনা দরিদ্র বাংলাদেশি ব্যক্তিটিও এনকাউন্টারের শিকার হয়...

আমার মনে আছে পুলিশ চারজনকে গুলি করে মারে, যাদের সকলেই ধর্ষক ও অপরাধী। পুলিশ চাইছিল এই ঘটনাটিকে আর্মির সাথে যৌথ অভিযান হিসেবে দেখাতে, ফলে পুরো ঘটনাকে নতুন করে সাজানো হয়। অপরাধীদের খুনের ঘটনায় লোকজন খুশিই হয়েছিল। সমস্যা তো বিচার ব্যবস্থায়, জিল যা সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি অন্যায়ভাবে নিজের আইন তৈরি করেছিলেন। আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ভীষণ হতাশ ছিল, কিন্তু এইভাবে খুন করা স্রেফ ভুল কাজ। আর সেই সাথে যে কারোরই রাস্তা থেকে আটক হয়ে তাৎক্ষণিক বিচারের মুখোমুখি হওয়ার বিপদ তো আছেই। এই ভয়টা এনকাউন্টারের ঘটনার চেয়েও মারাত্মক।

আরেকটা ইউনিটের ক্ষেত্রে এই ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটেছিল। ইউনিটটির সাইটেশন বা বিশেষ সম্মাননার জন্য আরও কয়েকটা পয়েন্ট প্রয়োজন ছিল। দুজন জঙ্গি হত্যা করলেই এই পয়েন্ট পাওয়া যাবে। ব্যাটালিয়নের হাতে সময় তখন খুব কম, না পারলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই ব্যাটালিয়নটি অনেক ভাল কাজ করেছে বলে তারা আরও বেশি মরিয়া। তারা এর আগে তেমন কোন বেআইনি কাজ করেনি। কিন্তু দুটো মাত্র লাশের অভাবে এত দিনের কঠোর পরিশ্রম পানিতে যাবে?

এখন কি আপনি বুঝতে পারছেন আমরা কী ধরনের চাপের মধ্যে কাজ করি এবং আমাদের কাছ থেকে ঠিক কী প্রত্যাশা করা হয়?

পয়েন্ট সিস্টেমটি এ রকম : মোটামুটি ৩০০ পয়েন্টের প্রয়োজন হয়। একেকটি হত্যাকাণ্ডের জন্য ৫ পয়েন্ট করে পাওয়া যায়। গ্রেপ্তারে ২ পয়েন্ট আর আত্মসমর্পণে ৩ পয়েন্ট পাওয়া যায়। এই ব্যাটালিয়নের মোট ১০ পয়েন্ট ঘাটতি ছিল, ফলে তারা মাফিয়াদের সাথে যোগাযোগ করে। মাফিয়ারা সদ্য বাংলাদেশ থেকে আসা দুই অবৈধ অভিবাসীকে তুলে নিয়ে আসে এবং তাদের এক সপ্তাহের মত সময় ব্যারাকে রেখে দেয়া হয়। তাদের এনকাউন্টার করা হয় এবং মুলতা (MULTA) জঙ্গি হিসেবে দেখানো হয়। এনকাউন্টার ঘটানো হয় ভোর সাড়ে তিনটা নাগাদ। স্থানীয় পুলিশের সাথে আগেই সমঝোতা করা হয়। এনকাউন্টারের পর ইউনিটটি সাইটেশন বা সম্মাননা ইত্যাদি পেয়ে যায়।

যে অফিসার এই দুজনকে খুন করেছিল সে বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয় এবং তার চিকিৎসা করার প্রয়োজন পড়ে। এ ছাড়া ইউনিটটির মধ্যে প্রশাসনিক সমস্যাও দেখা যায়, কারণ তারা মূলত দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সাধারণত অফিসারদের স্বেচ্ছায় হত্যা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। তিনজন অফিসার সোজা প্রত্যাখ্যান করে, চতুর্থ জন সম্মতি দেয়, 'ঠিক আছে, আমি কাজটি করব।' সে গুলি করে, কিন্তু এরপর নিজের এই কাজকে মেনে নিতে পারেনি।

যে পুলিশ অফিসার এই ফলস বা মিথ্যা এনকাউন্টারে আর্মিকে সাহায্য করেছিল সে কয়লা ও কাঠের এক বড় চোরাকারবারি...

আমি হলফ করে বলতে পারি, হত্যার কাজে স্বেচ্ছায় অংশ নেয়ার আহ্বান জানানো হলে সবাই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এটা কোন পার্টি নয়, যখন এই ঘটনাগুলো ঘটে, সামরিক ইউনিটের মধ্যে অস্থিরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের হত্যা করার জন্য কঠোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় কিন্তু তা যুদ্ধের ময়দানের জন্য, ঠান্ডা মাথায় খুন করার জন্য নয়। কেউ স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলে এটা তার নিজের ব্যাপার–ট্রিগার টানার ব্যাপারে সে নিজেকে কিভাবে বুঝ দেবে। নিরীহ মানুষকে তারাই হত্যা করে, যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল প্রকৃতির। তাদের জন্য এনকাউন্টার হল নিজের কাছে নিজেকে প্রমাণ করার ব্যাপার। আমার পর্যবেক্ষণ তা-ই বলে। সত্যিকার লড়াইয়ে এই মানুষগুলো সব সময় পেছন দিকে থাকে। প্রকৃত লড়াই একেবারেই ভিন্ন জিনিস। কাশ্মীরে আমাদের কঠিন কিছু মানুষকে মোকাবিলা করতে হয়েছে, কিন্তু এখানে পুরোটাই প্রহসন। প্রহসন মানে কিন্ত এই না যে এখানে সশস্ত্র যোদ্ধা বা জঙ্গি নেই। অবশ্যই আছে। শত শত আছে, কিন্তু তাদের ম্যানেজ করা সম্ভব। তারা আত্মঘাতী বোমা হামলা চালায় না এবং বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে...

একজন জঙ্গিকে খুন করা হয়ত ঠিকই আছে, কিন্তু সমাজের ওপর এর কী প্রভাব পড়বে? এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে গভীর নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা, মানুষ আমাদের আর বিশ্বাস করবে না। মানুষ জানে ওই ব্যক্তিটি জঙ্গি ছিল, কিন্তু তারা এটাও বোঝে যে কী প্রক্রিয়ায় তাকে হত্যা করা হয়েছে। তারা জানে পুরো ব্যাপারটাই মিথ্যা। ফলে পুরো গ্রাম মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাকে কিভাবে খুন করা হয়েছে–এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং এই বিপর্যয় গোটা উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলেছে। মানুষ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।

> ... ...এনকাউন্টারের ঘটনা প্রথম ঘটে ষাটের দশকে অন্ধ্র প্রদেশে আর তারপর পশ্চিমবঙ্গে। প্রথম এনকাউন্টারের ঘটনা নথিভুক্ত হয় তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সময়। আর পশ্চিমবঙ্গে নকশালদের আত্মসমর্পণের সময় মুখ্যমন্ত্রী এস এস রায় তরুণদের খুন করে দায়মুক্তি পান।

একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করা মানে আরও এক ডজন জঙ্গি তৈরি করা। ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার না হওয়া পর্যন্ত মিথ্যা হত্যা চলতেই থাকবে। ভিকটিম কোথা থেকে এসেছে তার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না, ফলে এই কাজ করে সহজে পার পাওয়া যায়।

আমাদের উচিত নিজেদের নীতিমালা ও মানসিক গঠন সম্পর্কে পুনরায় খতিয়ে দেখা। আমাদের মগজে অসুস্থতা।

মানুষ তো মানুষই। বার বার খতিয়ে দেখতে হয়, যে মানুষটাকে হত্যা করা হয়েছে সে আসলে একজন জঙ্গি কি না এবং আমাদের কোন ভুল হচ্ছে কি না। আর এটা কোন সহজ কাজ নয়।

এক উলফা ক্যাডারকে আসামের শোণিতপুর জেলায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশ একজন বোড়ো (Bodo) ওষুধের দোকানদারকে তুলে নিয়ে আসে। আসলে উলফা ক্যাডারটি স্রেফ বলেছিল যে সে ওই দোকান থেকে ওষুধ কেনে। কিন্তু তারা সেই ওষুধের দোকনদারকে উলফাকে সহায়তা করার অপরাধে জেলে পোরে। জেলে থাকা অবস্থায় তিনি জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন; কারণ তিনি জানতেন, তিনি না থাকায় তাঁর পরিবার বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি এমনকি উলফার একজন সমর্থকও ছিলেন না। জেলে আলী নামের

একজনের সাথে তাঁর পরিচয় হয় যে চুরির অভিযোগে জেলে ঢুকেছিল। আলী একজন নিয়মিত অপরাধী এবং জেলের নিয়ম-কানুনে অভ্যস্ত। আলী তাঁকে মোটরসাইকেল বিক্রির পরামর্শ দেয় এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে ১০ হাজার রুপি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে। আলী নিজে মোটরসাইকেলটি কিনে নেয় এবং বাকি টাকা পরে শোধ করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

ওই দোকান মালিক একসময় জামিন নিয়ে জেল থেকে বের হয়ে আসেন। আলীও জামিন নিয়ে জেলের বাইরে। তিনি আলীর সাথে যোগাযোগ করলে আলী তাঁকে টাকা নেয়ার জন্য বাড়িতে আসতে বলে। দোকান মালিক তাঁর দুই বন্ধুকে নিয়ে বাকি অর্থ নেয়ার জন্য আলীর বাড়িতে যান। আলী তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বাড়িতে এক রাত থেকে যেতে বলে এবং টাকা জোগাড়ের ছুতা দেখিয়ে বাড়ির বাইরে যায়। আলীর বাড়ির পাশেই একটি নির্মাণক্ষেত্রে একদল মুসলমান শ্রমিক বাড়ি নির্মাণের কাজ করছিল।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে আটটা নাগাদ দুজন শ্রমিক উঠে এসে ওই তিন অতিথির সাথে গল্প করছিল। হঠাৎ করে একদল সেনা এসে তাদের পেটাতে শুরু করে। তারা কথা বলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের কোন সুযোগই দেয়া হয়নি। প্রথমে তারা বোড়ো দোকানদার ও তাঁর বন্ধুদের পেটায়, কিন্তু অন্যরা বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে তাদেরও পেটানো হয়। তাদের পার্শ্ববর্তী ধানখেতে নিয়ে গুলি করা হয়। নির্মাণক্ষেত্রের অন্য শ্রমিকরা এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। কিন্তু যে গল্পটি প্রকাশিত হয় তা হল–তিনজন এনডিবিএফ (NDBF) ও দুজন মুলতা (MULTA) ক্যাডার এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে। সরকারি রেকর্ডে ঘটনাটি এভাবেই আছে।

> একেকটি হত্যাকাণ্ডের জন্য ৫ পয়েন্ট করে পাওয়া যায়। গ্রেপ্তারে ২ পয়েন্ট আর আত্মসমর্পণে ৩ পয়েন্ট পাওয়া যায়। এই ব্যাটালিয়নের মোট ১০ পয়েন্ট ঘাটতি ছিল, ফলে তারা মাফিয়াদের সাথে যোগাযোগ করে। মাফিয়ারা সদ্য বাংলাদেশ থেকে আসা দুই অবৈধ অভিবাসীকে তুলে নিয়ে আসে এবং তাদের এক সপ্তাহের মত সময় ব্যারাকে রেখে দেয়া হয়। তাদের এনকাউন্টার করা হয় এবং মুলতা (MULTA) জঙ্গি হিসেবে দেখানো হয়।

আসলে যা ঘটেছে তা হল, আলী অর্থ ফেরত দেয়া এড়াতে আর্মিকে এসব জানিয়েছে এবং বিনিময়ে আর্মির কাছ থেকেও অর্থ নিয়েছে। আর্মি ও আলী উভয়ের জন্য লাভজনক ছিল ঘটনাটি। যে ক্যাপ্টেন অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি পুরস্কারের জন্য সুপারিশ পেয়েছেন। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো সত্য ঘটনাটি জানতে পেরে সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে। আমাদের ইউনিটগুলোতে এ রকম বহু ঘটনা রয়েছে। ঠিক কতগুলো সুপারিশ করা হয় আর কতগুলো প্রত্যাখ্যাত হয় তার একটা হিসাব নিলে বেশ মজার হত। অবশ্য অনেক সুপারিশই পার হয়ে যায়। সে অবশ্য আরেক কেলেঙ্কারি।

আরেকটা ঘটনার কথা আমার খুব ভাল মনে নেই, কিন্তু আমি থাকা অবস্থায়ই ঘটনাটি ঘটেছিল। আমরা জানতাম আপার আসামের এক চা বাগানে ১২ জন বাংলাদেশিকে হত্যা করা হচ্ছে। সাধারণত আপার আসামে এই ধরনে মানুষদের সরবরাহ করা হয় না, কিন্তু আমার ধারণা কর্নেল খুব মরিয়া হয়ে গিয়েছিলেন। উলফা তখন আর সক্রিয় ছিল না, ফলে সেখানে তাদের পোস্টিংয়েরও কোন যৌক্তিকতা ছিল না। সেনাবাহিনী জায়গাটা ছাড়তে চাইছিল না, ফলে উলফা তখনও সক্রিয় আছে এ রকমটা দেখানোর চাপ ছিল। তারা শহরে প্রচার করত, যে কোন সময় জিহাদি আক্রমণ হতে পারে ইত্যাদি। পরে তারা মাওবাদীদের অনুপ্রবেশের গল্পও প্রচার করে, যা আমার কাছে মোটেও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। আসাম পুলিশ সফলতার সাথে এ রকম বহু মিথ তৈরি করেছে, হত্যা করেছে, আবার তৈরি করেছে। সশস্ত্র সংগ্রামকে যে কোন মূল্যে টিকিয়ে রাখতে হবে, এমনকি লাইফ সাপোর্টে রেখে হলেও। বুঝতেই তো পারছেন, দুর্নীতি ও পদোন্নতির গোটা ব্যবস্থাটিই ধসে পড়বে, যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

কনফেশনস : দ্য ট্রেড

হত্যাকাণ্ডের ওপর নির্ভর করে আমাদের কাজের মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু এর সাথে আরও অনেক কিছু যুক্ত : কোন ব্যাটালিয়ন ৪০টি হত্যা করেও অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত নম্বর পায় না আবার অনেক সময় তিনটি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েও কাঙ্ক্ষিত নম্বর পেয়ে যায়। এগুলো শেয়ারবাজারের মত ওঠানামা করে। জঙ্গিবাদের মাত্রার ওপর নির্ভর করে গ্রেড প্রদান করা হয়। এত ব্যাখ্যা করে কিন্তু কেউ আপনাকে এসব বোঝাতে যাবে না; কিন্তু সিস্টেমটা এভাবেই কাজ করে। আমরা সবাই এ সম্পর্কে জানি। বিষয়টা অনেকটা আদি পাপের মত। ধরুন মনিপুরে নম্বর বেশি পাওয়া যায়। ১৯৯০-এর দশকে আসামেও বেশ উঁচু নম্বর পাওয়া যেত। প্রায় এক দশক ধরে এ অবস্থা বজায় ছিল, কিন্তু এক পর্যায়ে এমন একটা অবস্থা দাঁড়ায় যে এসব হত্যাকাণ্ড এখন আর কারও গায়ে লাগে না, লাশ নিয়ে কেউ আর ধরনা বা মিছিল-সমাবেশের আয়োজন করে না। তা ছাড়া আমরাও সাবধান হতে শিখেছি। পরিস্থিতি এখনও জঘন্য, কিন্তু যেহেতু খুব বেশি তাড়াহুড়া নেই, তাই বাছাই করে করে হত্যাকাণ্ডের সময় পাওয়া যায়।

কিন্তু আমি এখনও বলিনি আসামে কাজ করতে কেন এত খারাপ লাগে।

ধরা যাক আপনি খুব ভাল মানুষ, আইন-কানুন মেনে চলেন, কিন্তু আপনার চারপাশে অন্য যেসব ইউনিট আছে তারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে যাচ্ছে, অথচ আপনি কিছুই করছেন না–কোন খুন করছেন না। আশপাশের সব এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটছে, কিন্তু আপনার এলাকায় কিছু ঘটছে না। আপনি প্রশ্নের মুখে পড়বেন, 'এটা কিভাবে সম্ভব যে শুধু এই এলাকাতেই জঙ্গি নেই?' আপনার সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, আপনার মনে হবে আপনি একজন লুজার বা ফালতু লোক। ৫০ জন মানুষের ক্যারিয়ার ঝুঁকির মুখে পড়বে স্রেফ আপনার ভুল জায়গায় নৈতিকতা চর্চার কারণে। প্রত্যেকে যা করছে তা না করে আপনি অন্যদের ক্যারিয়ারের ক্ষতি করছেন। এটা কোন ভারসাম্যপূর্ণ খেলার মাঠ নয়। আপনার নিজের ইউনিটের মধ্যে ও ইউনিটের বাইরে আপনাকে প্রশ্নের মধ্যে পড়তে হবে–কেন আপনি রাজা হরিশচন্দ্রের পুত্র হতে চাইছেন। এটা এক ধরনের পিয়ার প্রেসার বা সহকর্মীদের মধ্য থেকে আসা চাপ–বিশ্বাস করুন, এটা বিশাল একটা চাপ।

২০০৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার বলেন যে গ্যালেন্ট্রি অ্যাওয়ার্ড বা সাহসিকতার পুরস্কারের জন্য এই সব হত্যাকাণ্ড ঘটানো হচ্ছে। বিচারপতি আফতাব আলম ও বিচারপতি সিঙ্গভি বলেন, সাহসিকতার পুরস্কার আর পদোন্নতির জন্য ভুয়া এনকাউন্টার ঘটানো হয়। পুরো ঘটনাই শয়তানের মত পরিকল্পনা করা হয়। সুতরাং আপনি কি বলতে চান যারা ক্ষমতায় আছে তারা কেউ জানে না এসব ঘটনা কিভাবে ঘটছে?...

জম্মু ও কাশ্মীরে সীমান্তের কাছে নিয়োজিত ব্যাটালিয়ন পাকিস্তানি

গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে অস্ত্র কেনে। বিহার ও উত্তর প্রদেশের মুসলমান পুরুষদের অপহরণ করে জম্মুতে দুই থেকে তিন মাস আটকে রাখা হয়। এরপর অস্ত্র কেনা হয়ে গেলে তাদের হত্যা করে অস্ত্রসহ অনুপ্রবেশকারী জঙ্গি হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়। কমান্ডিং অফিসার বা সিওর পক্ষে প্রশংসাসূচক রিপোর্ট যায় এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিট সাইটেশন বা বিশেষ সম্মাননা পায়। ভিকটিমদের প্রকৃত পরিচয় শনাক্ত করা কঠিন কিছু নয়, কারণ তাদের চেহারা বা পোশাক-আশাক কোন কিছুই পাকিস্তান থেকে আসা জঙ্গিদের মত নয়। কিন্তু এই সব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিয়ে কে আর মাথা ঘামাতে যায়।

জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুলা ডিভিশনের কমান্ডিং অফিসার এক লেফটেন্যান্ট জেনারেলের কথাই ধরা যাক। তাঁর সময়ে একশ বা তার চেয়েও বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটে। আর আমি জানি, কাশ্মীর উপত্যকার যেসব 'অচিহ্নিত কবর' সম্পর্কে সবাই কমবেশি জানে, সেগুলোর অনেকগুলোই তাঁর সৃষ্টি। অন্যদের না জানিয়ে তো এই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটানো সম্ভব ছিল না। এর সাথে আরো অনেকেই যুক্ত ছিল। কাশ্মীর উপত্যকা ছেড়ে যাওয়ার সময় তিনি ১৭.৫ কোটি রুপি নিয়ে গেছেন বলে তাঁর অফিসাররাই বলাবলি করেছে। তিনি পরে মাস্টার জেনারেল অর্ডনেন্স বা এমজিও হন আর একেকজন এমজিও কমপক্ষে ২০০ কোটি করে কামাই করেন। তাঁরা তাঁর সম্পর্কে কৌতুক করে বলেন তিনি নিশ্চয় ৫০০ কোটি কামিয়েছেন। তাঁকে একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিসা দিতে অস্বীকার করে; কারণ এফবিআই সে সময় তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র বাণিজ্য নিয়ে তদন্ত করছিল। তিনি কানাডা উড়ে যান এবং সেখানেই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সিবিআই যখন ভারতে তাঁর বাড়িতে ২০ কোটি রুপিসহ তাঁকে হাতেনাতে ধরে, তখন তিনি ক্ষমতাসীন দলকে ১০০ কোটি এবং বিরোধী দলকে ৮০ কোটি রুপি দেয়ার কথা স্বীকার করেন। এরপর আর সেই মামলা নিয়ে কেউ এগোয়নি।

> উলফা তখন আর সক্রিয় ছিল না, ফলে সেখানে তাদের পোস্টিংয়েরও কোন যৌক্তিকতা ছিল না। সেনাবাহিনী জায়গাটা ছাড়তে চাইছিল না, ফলে উলফা তখনও সক্রিয় আছে এ রকমটা দেখানোর চাপ ছিল। তারা শহরে প্রচার করত, যে কোন সময় জিহাদি আক্রমণ হতে পারে ইত্যাদি। পরে তারা মাওবাদীদের অনুপ্রবেশের গল্পও প্রচার করে, যা আমার কাছে মোটেও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। আসাম পুলিশ সফলতার সাথে এ রকম বহু মিথ তৈরি করেছে, হত্যা করেছে, আবার তৈরি করেছে। সশস্ত্র সংগ্রামকে যে কোন মূল্যে টিকিয়ে রাখতে হবে, এমনকি লাইফ সাপোর্টে রেখে হলেও। বুঝতেই তো পারছেন, দুর্নীতি ও পদোন্নতির গোটা ব্যবস্থাটিই ধসে পড়বে, যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

আরেকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ২০০৫ থেকে ২০০৬ সালে কাশ্মীর উপত্যকায় ৪৪টি হত্যাকাণ্ড ঘটান, আর্মির নিজস্ব তদন্তে যার সব কটিই ভুয়া এনকাউন্টার বলে প্রমাণিত হয়। তিনি এর আগে আসামের একটি ডিভিশনের জিওসি (জেনারেল অফিসার কমান্ডিং) ছিলেন। বলা হয়, এসবের তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে গেলেও খুন হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু আমি জানি, এসব তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে, যারা সংগ্রহ করেছে তাদের সাথে আমি কথাও বলেছি। সেনাপ্রধান এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের কথা জানতে পেরে অবিলম্বে সব কিছু ধ্বংস করার নির্দেশ প্রদান করেন। এর সাথে যুক্ত লোকজন এমনকি বিশেষ সম্মাননাও (সাইটেশন) পেয়েছে। এর নাম 'খুনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা'।

তাদের কাজ করার ধরনটি বেশ ইন্টারেস্টিং : ব্রিগেড কমান্ডার স্থানীয় এসআইবি (সাবসিডিয়ারি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) কর্মকর্তাকে ম্যানেজ করেন, যেন তিনি নিহত ব্যক্তিকে জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাতেই পুরো বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। একবার চিত্রটা সম্পর্কে ভাবুন তো : একটা ডিভিশনই সমস্ত হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে, বাকিরা কিছুই করছে না, ফলে অন্যরাও নিজেদের পরিসংখ্যান ঠিক রাখার জন্য হত্যা করতে শুরু করে।

একবার মনিপুরে এক জিওসি দেখলেন তিনি দুটি হত্যায় পিছিয়ে আছেন। তিনি এবং আমি–এই দুজন সত্যটা জানি : তিনি তাঁর অধীনদের ডেকে তিনটি লাশ জোগাড় করার হুকুম দিলেন। ওই রাতেই আরও তিনজন মানুষ খুন হয়।

সিস্টেমের অংশ হয়ে গেলে আপনি উন্নতি করতে পারবেন, কিন্তু ভাল কাজ করতে চাইলে আপনাকে একঘরে করা হবে।

চক্র (সাহসিকতার পুরস্কার, যার নামের শেষে 'চক্র' কথাটি থাকে) থেকে পয়েন্ট পাওয়া যায়, কিন্তু চক্রগুলো আপনি কিভাবে পাবেন? মানুষ হত্যা করো, পয়েন্ট যোগ করো, ওপরের র‍্যাংকে ওঠো। এর একমাত্র শিকার হল সত্য। তারা গল্প বানায়–কিভাবে তারা 'জীবনের ঝুঁকি নেয়' এবং 'সন্ত্রাসী হামলা ঠেকাতে সক্ষম হয়' এবং হত্যা করে। কেস ধামাচাপা দেয়া না গেলে আর্মি দ্রুত তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্তগুলোও করা হয় বেশ হাস্যকরভাবে। আমার সিও (কমান্ডিং অফিসার) জিজ্ঞাসাবাদ করবে আরেকজন সিওকে এবং সেই সিও করবে আমার সিওকে। ফলে এই সব তদন্ত কোন কাজের না; আর এর ফলেই তদন্তের পরিসংখ্যানগুলো বেশ দুশ্চিন্তার বিষয়। আর্মির মানবাধিকার সেল জম্মু কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে ১৯৯৩ থেকে ২০১৩ সালে ১,৩৯৪টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তদন্ত করে, যার মধ্যে ১,৩৪০টি অভিযোগকে মিথ্যা বলে রায় দেয়া হয়। আমার কাছে জানতে চাইলে আমি বলতাম, এর প্রতিটি অভিযোগই সত্য।

আমি এখানে জঘন্য সব এনকাউন্টারের কথা বলছি, যেখানে নির্দোষ মানুষ খুন হয়েছে। একটা ইউনিট ছিল, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না যে তারা কী ধরনের কাজ করত। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে হাত মিলিয়ে তারা সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে কাঠ পাচার সহায়তার বিনিময়ে অবৈধ অর্থ উপার্জন করত। এগুলো তো রুটিন বা নিয়মিত ঘটনা। গোটা এলাকার সংরক্ষিত বন পদ্ধতিগতভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। তাদের জন্য জঙ্গি জোগাড়ে এই অর্থ কাজে লাগত। তবে তাদের অর্থ উপার্জনের আরেকটি অভিনব উপায় ছিল। মোটরসাইকেল উৎপাদনকারীর মোটরসাইকেল ভর্তি প্রতিটি ট্রাক থেকে তারা একটি করে নতুন মোটরসাইকেল নামিয়ে রাখত। ডিলাররা বিষয়টা সম্পর্কে অবগত ছিল। একজন নির্দোষ মানুষ জোগাড়, তাকে জঙ্গি সাজানো এবং হত্যা করার জন্য এই অর্থ কাজে লাগত।

এই ইউনিটেরই একটা ঘটনার কথা জানি, যা একেবারেই অবিশ্বাস্য। রেলস্টেশনে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত এক ভিক্ষুক ছিল। সে সময় ভুটানের রাজকীয় আর্মির সাথে যৌথ একটা অপারেশন চলছিল। সেই অপারেশনের মধ্যে ওই ভিক্ষুককে তুলে নিয়ে আসা হল।

ভিক্ষুকের অনুপস্থিতি কারো নজরে পড়েনি, কারণ সে খুব বেশি পুরাতন লোক ছিল না। ভিক্ষুকটিকে ভুটান সীমান্তে নিয়ে হত্যা করা হয় এবং এনডিএফবি সার্জেন্ট বলে পরিচয় দেয়া হয়। আমি এখন লোকটির নাম মনে করতে পারছি না। সিস্টেমটা এমন যে জানাজানি হয়ে গেলে ঊর্ধ্বতনরা বিষয়টা নোট করে রাখে, কমান্ডিং অফিসারকে তিরস্কার করা হয়; কিন্তু যেহেতু তীব্র সমালোচনা হবে, তাই বিষয়টা প্রকাশ করা হয় না। কিন্তু চিন্তা করুন, একজন ভিক্ষুক ও কুষ্ঠরোগী–স্রেফ লোভের কারণে আপনি তার অস্তিত্ব বিনাশ করলেন!

অবৈধ কাজ তো অবৈধই, কিন্তু কিছু লোক আছে এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের জন্য অনেক বাড়াবাড়ি করে। উত্তর-পূর্ব ভারতে আপনি যদি অজানা-অচেনা কেউ হন তাহলেই আপনি খুন হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন। যেসব মানুষ কোন রেকর্ডে থাকে না, তাদের একটা তালিকা মাফিয়াদের কাছে আছে। বেশি দরকার পড়লে এই লোকজনকে তুলে নেয়া হয়।

রাঙ্গিয়াতে এক শিখ পুলিশ অফিসার ছিল। এই লোকটাই সেই ভিক্ষুককে তুলে নিয়েছিল। একজন অফিসার সাধারণত এর জন্য সরবরাহকারী 'একে' (ছদ্মনাম), তার দলবল ও পুলিশের সহায়তা নেয়। সে সাধারণত পুলিশকে ঘুষ দিত এবং বাইহাটা চাড়িয়ালি নামের একটা কুখ্যাত জায়গায় লেনদেনের কাজ সম্পন্ন হত। জায়গাটা রাঙ্গিয়ার কাছেই। পুরো এলাকাটা একটা নরক। আপনি তো জানেন, নিম্ন আসাম এলাকাটিতে মিশ্র জনগোষ্ঠীর বসবাস এবং বহুদিন ধরেই সেখানে গোলমাল চলছে। নলবাড়ি ও বড়পেটা ছিল উলফার আস্তানা। এর পেছনে রয়েছে বিএলটি (বোড়ো লিবারেশন টাইগারস) ও এনডিএফবির এলাকা। ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীর জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন সশস্ত্র দল। অপর পারেই ভুটান, যা নিরাপদ আশ্রয়স্থল। ওরা নদী পার হয়ে চলে যেতে পারে, কারণ ভুটানের সাথে ভারতের কোন সীমানাপ্রাচীর নেই এবং সীমান্তের প্রহরাও বেশ ঢিলেঢালা। পঁচিশ বছর ধরে অস্ত্রের প্রভাবের নিচে থাকার কারণে সেখানে এনকাউন্টার করতে তেমন বেগ পেতে হয় না। জায়গাটা আসামের সবচেয়ে খারাপ এলাকা।

এমনকি আমিও বাইহাটা চাড়িয়ালি এলাকাটি থেকে দুজনকে ক্রয় করেছিলাম। এরা ছিল দুই জঙ্গি, যাদের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি যাওয়ার আগেই তুলে নেয়া হয়। কেন্দ্রীয় জেল থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে তাদের অপহরণ করা হয়। পাগলামি মনে হলেও এগুলো কিন্তু রুটিন বা নিয়মিত ঘটনা। সরবরাহকারীরা এই ধরনের মানুষকে নিয়মিত টার্গেট করে, তাদের জেল থেকে বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তারপর তুলে নেয়। গ্রামের লোকজন মনে করে তারা হয়ত এখনও জেলেই আছে, ফলে তাদের অনুপস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। এদের নিয়ে উন্মুক্ত দরপত্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং আমি বিডিংয়ে জয় লাভ করেছিলাম।

আসামে তখনও টিনটেড বা কালো কাচ নিষিদ্ধ হয়নি, বেশির ভাগ গাড়িতেই কালো কাচ লাগানো থাকত। পুলিশ দূর থেকে লক্ষ করে; একটা গাড়ি আসে; আপনার গাড়ি অপেক্ষা করে; সাধারণত নাম্বার পেট পাল্টানো কোন বন্ধুর গাড়ি ব্যবহৃত হয়। অফিসারের নিজের ব্যক্তিগত গাড়িও ব্যবহৃত হতে পারে, নকল নাম্বার প্লেট আমাদের সাথেই থাকে। এই ধরনের লেনদেনের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় গাড়ি ছিল মারুতি ভ্যান, কারণ সাইডিং দরজা ব্যবহার করে সহজেই বিনিময় করা যায়। হিন্দি সিনেমায় দেখানো দৃশ্যগুলো এই অর্থে মিথ্যা নয়। ঘুমের ওষুধ দেয়া ভিকটিমকে অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তর করা হয় এবং তখনই সংশ্লিষ্ট ইউনিটে নিয়ে যাওয়া হয়। ভিকটিমের ডাক্তারি পরীক্ষা করে আমরা এরপর কয়েক দিন পর্যবেক্ষণে রাখি। তার ব্যাপারে ভাল করে খোঁজখবর নেয়া হয় এবং ইন্টারোগেট করে দেখা হয় সে হত্যা করার জন্য নিরাপদ কি না। সে হয় একজন জঙ্গি বা ছোটখাট চোর কিংবা নিরীহ বাংলাদেশি অভিবাসী–বলতে পারেন এ বিষয়টি কে নিশ্চিত করে? থানার স্থানীয় এসএইচও (স্টেশন হাউস অফিসার)।

এসএইচও কখনও অর্থ পায়, কখনও পায় না। তবে পুলিশ বাহিনীকে সাথে রাখার একটা তাগিদ আর্মির দিক থেকে সব সময়ই থাকে, কারণ এতে আমাদের সুবিধাই হয়। পুলিশ ও আর্মি উভয়েরই উদ্দেশ্য এক–অর্থ, পদবি ও পুরস্কার।

পরিচয় নিশ্চিত করে সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ স্টেজ তৈরি করে। আমরা সামরিক চিন্তা ব্যবহার করি : যদি সত্যিকারের এনকাউন্টার হত তাহলে ঘটনার ক্রনোলজি বা ক্রমধারা কী রকম হত? তখন আমরা পুলিশকে বলি কিভাবে পুরো ব্যাপারটা সাজাতে হবে। হত্যাকাণ্ডের তিন দিন আগেই ঘটনাস্থল ঠিক করা হয় এবং গোয়েন্দা তথ্য ম্যানিপুলেট বা সুবিধামত পরিবর্তন করা হয়।

এরপর তাকে গুলি করা হয়। আমি কখনই গুলির আগে কাউকে কোন প্রতিক্রিয়া করতে দেখিনি। হাত কখনই বাঁধা হয় না। তারা জানে কী ঘটতে যাচ্ছে, তারা কোন বাধা দেয় না। বলা যেতে পারে, হাল ছেড়ে দেয়।

কেবল একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে, যেখানে আমাদের এক অফিসারের গুলি করার কথা। জায়গাটা গুয়াহাটি থেকে আপার আসামের পথে, সোনাপুরের কাছে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, ভিকটিম ব্যক্তিটি কেমন করে কান্নায় ভেঙে পড়ে অফিসারের পায়ে পড়ে যায়। তখন গুলি করা কঠিন হয়ে যায়। অফিসারটি অবশেষে তার সহকারীর হাতে বন্দুক তুলে দেয় এবং তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এই সব শুটিং দেখতে পছন্দ করি না। আমি দুর্বল হৃদয়ের মানুষ, কিন্তু আমার জানা থাকে যে একজন মানুষকে গুলি করা হচ্ছে। আমি জানি ঠিক কখন গুলি করা হবে, কতটি গুলি তার শরীরে ঢুকবে এবং কোন দিক থেকে...

কর্নেল এস (ছদ্মনাম) তখন ইম্ফলে। আইইডি (ইম্প্রুভাইজ এক্সপোসিভ ডিভাইস) বিস্ফোরণে পাঁচজনের মৃত্যু হয়। এর কয়েক দিন পরে এনকাউন্টারে পাঁচজন মারা যায়, আর এক মেজর অশোক চক্র লাভ করে। কর্নেল এস তাঁর লোকজনকে বলেন, 'আমাদের ওপরে অনেক চাপ আর আমাদের তো টিকে থাকতে হবে।' ঘটনাটার কথা আমি জানি, কারণ তাঁরা গুয়াহাটিতে 'কেনাকাটা' করতে এসেছিলেন। আপনি জানেন 'কেনাকাটা' মানে কী? এমন একটা সময়, যখন আপনার খুব জরুরি প্রয়োজন, ফলে ভিকটিম বা শিকার সরবরাহের জন্য ওই সব গ্যাঙের লোকজনকে খুঁজছেন। তারা কখনও কখনও ব্যর্থ হতে পারে। কিন্তু আপনাকে তো হত্যা করে দেখাতেই হবে। ফলে আপনি নিজেই খোঁজা শুরু করলেন আর গুয়াহাটি হচ্ছে এ রকম একটা স্থান, যেখানে এসব নিয়ে চুক্তি হয়। আপনি স্রেফ রাস্তা থেকে কাউকে তুলে নিতে পারেন না। অনেকটা অস্ত্র বা মাদক বা অন্য কোন অবৈধ পণ্য কেনাকাটার মতই একটা বিষয়। ভিকটিম সব সময়ই পাওয়া যায়, পর্যাপ্ত পরিমাণেই পাওয়া যায়, কিন্তু সাপ্লাই চেইন জানাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কেউ এই চেইন ভঙ্গ করে না, শুধু যোগ করে।

বইটির লিংক: Kishalay Bhattacharjee-Blood_On_My ... Confessions_of_Staged_Encounters.pdf